Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 197 – 205
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

হাসান আজিজুল হক-এর নামহীন গোত্রহীন গল্পগ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধ ও নারী

সাদিয়া আফরোজ সিফাত
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা, বাংলাদেশ
ইমেইল : sadiashifat@gmail.com

Keyword
মুক্তিযুদ্ধ, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, ম্যারিটাল রেইপ, মেল গেজ (Male Gaze)।

Abstract
Hasan Azizul Haque is one of the most important writer of Bangladesh for his narration and insight of society. His writings display the true character of people and social forms. The freedom fight of Bangladesh played a great part in his short story book 'Namhin Gotrohin". How he displayed females within the phase of the liberation war and afterward, that is the search point of this paper. He portrayed women as passive members of the liberation war. They (women) took part as a victim in his stories of this book. The passive narration of building the character of women is seen even in the statement of this book. Hasan Azizul Haque's writeup showed immense promise to show the true history of the liberation war and afterward but women did not share proper light and attention.

Discussion

এক

মুক্তিযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যে অনিবার্য সত্যের মতো জায়গা করে নিয়েছে। বাঙালির স্বরূপ চেতনা জাতীয়তাবাদের বোধে জাগরণের এ কাল বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের যেমন অবধারিত সত্য তেমনি সাহিত্যেও সত্য। বাঙালির মননবিশ্বে যে নতুন ভাবধারা সঞ্চারিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের কারণে তারই প্রতিফলন ঘটেছে সাহিত্যে। মুক্তিযুদ্ধপূর্ব ও পরবর্তী সময়ের গল্পকারগণের সাহিত্যে আন্দোলন-সংগ্রাম, যুদ্ধ বিধ্বস্ততা এবং যুদ্ধ পরবর্তী জীবনের আশা-নৈরাশ্যের দোলাচল মূর্ত হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সর্বপ্লাবী বিকাশ ঘটেছে একই সাথে বাঙালির জীবনে।

> "শত্রু কবলিত নগরের অবরুদ্ধ মানুষের অসহায়ত্বের চিত্র, স্বদেশভূমি থেকে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পালিয়ে বাঁচা মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা যেমন বাঙময় হয়ে উঠেছে, তেমনি হানাদারদের হত্যা,

লুণ্ঠন, নির্যাতন, ধর্ষণ, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের চিত্র, সম্মুখযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বীরত্ব, আত্মদানের গৌরবময় ছবি ফুটে উঠেছে ছোটগল্পের ক্ষুদ্র ক্যানভাসে।"[১]

মুক্তিযুদ্ধের গল্পসমূহের প্রবণতা লক্ষ করলে আমরা দেখি -

১. মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংস ও নির্যাতনকে সর্বজ্ঞের দৃষ্টি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।
২. অত্যাচার-লুণ্ঠন-নির্যাতনের দৃশ্যায়নই প্রাধান্য লাভ করেছে।
৩. মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী হতাশা-নৈরাশ্যবোধের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।
৪. স্বাধীনতাকে সব মুশকিল আসানের ইউটোপিয়ায় পর্যবসিত করে আশাভঙ্গের বেদনা তুলে ধরা হয়েছে।
৫. আহত মুক্তিযোদ্ধা, স্বজনহারা মানুষের মনোবৈকল্যের চিত্রায়ণ ঘটেছে।

দুই

মুক্তিযুদ্ধের গল্পকারগণ যেমন যুদ্ধ বিধ্বস্ততার মাঝেও গল্প রচনা করেছেন তেমনি যুদ্ধ পরবর্তী সময়েও যুদ্ধকেন্দ্রিক গল্প রচনা করেছেন। গল্পকারদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে যোদ্ধা ছিলেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধ জাতিগত প্রেরণার আধার তো বটেই এরই সাথে ব্যক্তি গল্পকারের অনুপ্রেরণার অনুষঙ্গও হয়ে ওঠে।

"মুক্তিযুদ্ধের উপাদানপুঞ্জ ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রায় সব গল্পকারই রচনা করেছেন ছোটগল্প।"[২]

মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধের অভিঘাত, মুক্তিসংগ্রামের চেতনা ও যুদ্ধের নানা উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা গল্প। মুক্তিসংগ্রামের চেতনা ও যুদ্ধের নানা উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা গল্প। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উল্লেখযোগ্য গল্প ও গল্পকারগণ হলেন- সত্যেন সেন (১৯০৩-১৯৮১) 'পরিবানুর কাহিনী', তাজুল ইসলাম ফিরোজী 'সপ্তর্ষি অনেক দূরে', মঞ্জু সরকার (জন্ম. ১৯৫৩) ('শান্তি বর্ষিত হোক', শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮) 'সোজা রাস্তা, আকাল দর্শন', আফসান চৌধুরী (জন্ম. ১৯৫২) 'ফাটা শহরের গল্প', সিরাজুল ইসলাম (জন্ম. ১৯৩৯) 'দূরের খেলা', রাহাত খান (১৯৪০-২০২০) 'মধ্যিখানের চর', রশীদ হায়দার (১৯৪১-২০২০) 'কল্যাণপুর, এ কোন ঠিকানা', মীর নূরুল ইসলাম 'স্বৈরিণী ফিরে এসো', কায়েস আহমেদ (১৯৪৮-১৯৯২) 'আসন্ন', আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) 'অপঘাত', মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮) 'কালো মাফলার, সেলিনা হোসেন (জন্ম.১৯৪৭) 'আমিনা ও মদিনার গল্প', মঈনুল আহসান সাবের (জন্ম. ১৯৫৮) 'কবেজ লেঠেল, ভুল বিকাশ', সুচরিত চৌধুরী (১৯৩০-১৯৯৪) 'নিঃসঙ্গ নিরাশ্রিত', আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩৪-২০২২) 'কেয়া, আমি এবং জারমান মেজর', জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২) 'সময়ের প্রয়োজনে', শামসুদ্দিন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭) 'পুঁই ডালিমের কাব্য', আমজাদ হোসেন (১৯৪২-২০১৮) 'উজানে ফেরা', হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) 'শীত, উনিশ শ একাত্তর', রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-২০১৯) 'ইজ্জত', হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪) 'যাদুকরের মৃত্যু', মামুন হুসাইন (জন্ম. ১৯৬২) 'মৃত খড় ও বাঙাল একজন' ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধনির্ভর গল্পের গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে বেশকিছু। উল্লেখযোগ্য গল্পকার ও গ্রন্থসমূহ হল: বশীর আল হেলাল-এর *প্রথম কৃষ্ণচূড়া* (১৯৭২), হাসান আজিজুল হক-এর *নামহীন গোত্রহীন* (১৯৭৫), আলাউদ্দিন আল আজাদ- এর *আমার রক্ত, স্বপ্ন আমার* (১৯৭৫), শওকত ওসমান- এর *জন্ম যদি তব বঙ্গে* (১৯৭৫), আবু জাফর শামসুদ্দিন- এর *রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা* (১৯৭৭), আবু বকর সিদ্দিক- এর *মরে বাঁচার স্বাধীনতা* (১৯৭৭), সাদেকা শফিউল্লাহ -এর *যুদ্ধ অবশেষে* (১৯৮০), খালেদা সালাহউদ্দিন- এর *যখন রুদ্ধশ্বাস* (১৯৮৬), সৈয়দ ইকবাল-এর *একদিন বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য গল্প* (১৯৮৬), এহসান চৌধুরী'র *একাত্তরের গল্প* (১৯৮৬), কাজী ফজলুল রহমান- এর *ষোলই ডিসেম্বর ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৮৮), সৈয়দ শামসুল হক- এর *জলেশ্বরীর গল্পগুলো* (১৯৯০), বিপ্রদাস বড়ুয়া'র *যুদ্ধজয়ের গল্প* (১৯৯১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম গল্পসংকলন প্রকাশ করেন আবদুল গাফফার চৌধুরী। প্রথমে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীকালে ঢাকা থেকেও সংস্করণ বের হয়। এ সংকলনের নাম *বাংলাদেশ কথা কয়* (১৯৭১)। এ সংকলনের লেখকরা ছিলেন-সত্যেন সেন, শওকত ওসমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, আসাদ চৌধুরী, সুব্রত বড়ুয়া, অনু ইসলাম, কায়েস আহমেদ, বিপ্রদাস বড়ুয়া, ফজলুল হক প্রমুখ। এছাড়াও আবিদ রহমান সম্পাদিত *প্রেক্ষাপট ৭১*, ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। শওকত ওসমান ও শামীমা হাসিন সম্পাদিত *প্রতিবিম্বে প্রতিদ্বন্দ্বী* (১৯৮১), আবুল হাসনাত সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের গল্প (১৯৮৩), হারুণ হাবিব সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৫), বিপ্রদাস বড়ুয়া সম্পাদিত *মুক্তিযোদ্ধার গল্প* (১৯৯১) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন।

তিন

মুক্তিযুদ্ধনির্ভর গল্প আমাদের সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। মুক্তিযুদ্ধের ক্রিয়া আমাদের সাহিত্যিক অঙ্গনেও যথেষ্ট অবদান রেখেছে। বরং সাংস্কৃতিক চেতনার জগতে মুক্তিযুদ্ধের ক্রিয়ারেখার আদল এখান থেকে আন্দাজ করে নেয়া যায় অনেকটাই।

> "বোঝা যায় যুদ্ধটা অলক্ষ্যে পা বাড়িয়েছিল সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও।"[৩]

হাসান আজিজুল হক ১৯৭১ সালের পরবর্তী সময়গুলোতে সমকাল, মানুষের যুদ্ধকালীন দুঃখ ও ক্ষোভকে কেন্দ্র করে বহু গল্প রচনা করেন। কেননা, নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দুর্বিষহ যাতনা বাংলার জনগণকে এর পরবর্তী কয়েক দশক পর্যন্ত বহন করতে হয়েছিল।

হাসান আজিজুল হক এর *নামহীন গোত্রহীন* মুক্তিযুদ্ধনির্ভর গল্পগ্রন্থ। গল্পকার তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞানে জারিত করে মানুষের আনন্দ বেদনার নির্যাস সঞ্চারিত করেছেন তাঁর লেখনীতে। পাকিস্তানপূর্ব ও সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ - পরাধীন ও স্বাধীন দুই দেশের অভিজ্ঞতাই তাঁর গল্পের রসদ হিসেবে কাজ করেছে। পাকিস্তানি শাসনামল স্বৈরাচারী দৌরাত্ম্য এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের আশা ও আশাভঙ্গের বেদনাজাত তীব্র হতাশ্বাসের সাথে গল্পকারের পরিচয় সুনিবিড়। সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ও যাপিত জীবনের দহন, লাঞ্ছনা, বেদনাবোধের ইতিহাস তাঁর গল্পের জান্তব রূপ লাভ করেছে।

ভাববিলাসিতার বদলে বস্তুবাদ ও বাস্তবচিন্তাই তাঁর গল্পে প্রধান হয়ে উঠেছে। মূলত নিম্নবর্গ মানুষের জীবন যাপন, আর্তি, লালসা, জিঘাংসা সবই প্রকাশিত তার গল্পে-

> "তাঁর গল্পে যেখানে জীবনের আলোকোজ্জ্বল প্রকাশ, সেখানে প্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য অভিসঞ্চার এবং সেখানে জীবন আর প্রকৃতি একই পাত্রে লালিত, সেখানে তাকে মহার্ঘ করে তোলে মানবপ্রবৃত্তির কতকগুলো অনিবার্য ধর্ম-হিংসা, দ্বেষ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, অনবদমিত যৌনাচার, ভ্রষ্টাচার, মিথ্যাচার, লিপ্সা, লালসা, জিঘাংসা, স্বার্থপরতা, জুগুপ্সা ইত্যাদি।"[৪]

ইড-ইগো-সুপার ইগোর সমন্বয়ে মানুষের আচরণ ও তাঁর ক্রিয়া নির্ধারিত হয়। আদিম প্রবৃত্তির অবদমনে মানব প্রকৃতিতে নানা রকম বিকৃতি লক্ষনীয়। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পর্যুদস্ত মানবজীবনে গল্প লিখেছেন তিনি। হাসান আজিজুল হক জীবন বাস্তবতার বিপর্যস্ত মানুষের ছবি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। ফলে মুক্তিযুদ্ধের বিপর্যস্ততা মানুষকে যে এক অসীম নৈরাশ্যের গহবরে ঠেলে দিয়েছিল, আধুনিক শিল্প মতাদর্শের সঙ্গী করে তাকে ভাষ্যরূপ দিয়েছেন গল্পকার-

> "হাসান তাঁর গ্রন্থের সাতটি গল্পের মধ্যে যেসব ঘটনা বা বাস্তব সত্যের অবতারণা করেছেন সেগুলোর কোনোটাতেই কাল্পনিকতার তেমন প্রশ্রয় নেই এবং এই কারণেই 'নামহীন গোত্রহীন' গ্রন্থটিকে ইতিহাসও বলা চলে।"[৫]

চার

নামহীন গোত্রহীন গল্পগ্রন্থে যে ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে যে ইতিহাস অত্যাচার-নির্যাতনের এবং এরই সাথে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়াও এ গল্পে লিপিবদ্ধহয়েছে। খাঁচার বন্দি পাখির মতো মানুষের নিরুপায় যন্ত্রণা যেমন এ গ্রন্থে লক্ষণীয় তেমনি দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষের ঘুরে দাঁড়ানো বাস্তবতা এ গ্রন্থে দেখা যায়।

নামহীন গোত্রহীন গল্পগ্রন্থে আমরা দুই সময়ের গল্প দেখতে পাই। ক- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অভিজ্ঞতার গল্প। খ। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের গল্প। 'ভূষণের একদিন', 'নামহীন গোত্রহীন', 'কৃষ্ণপক্ষের দিন' ও 'আটক' গল্পগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের ভয়াবহতা, পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস আচরণ ও নারীর প্রতি সহিংসতার জান্তব রূপ ফুটে উঠেছে। 'ঘর গেরস্থি', 'কেউ আসেনি', 'ফেরা' গল্পে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের আশাভঙ্গ, হতাশা ও ক্লান্তির রূপ প্রকট আকার ধারণ করেছে। এই গল্পগুলোতেও নারীর অবস্থান প্যাসিভ। এ গল্পগ্রন্থের নারী চরিত্রগুলো পর্যালোচনা করলে নারীর যে অবস্থানগুলো আমরা দেখি তা হল-

১. ধর্ষিত ও নির্যাতিত নারী
২. সাহসী ও স্বার্থলোভী মাতৃত্বের নবতর রূপ
৩. উদ্বাস্তু নারী

নামহীন গোত্রহীন গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'ভূষণের একদিন'। দরিদ্রের সন্তান ভূষণ, স্বল্পতম জমি ছাড়া তার আর কোনো সম্বল নেই। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে যুদ্ধের জন্য আহবান জানালেও সে বুঝতে পারে না কেন এই সংঘাত।

> "যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় তাদেরকে দেশের স্বাধীনতা -পরাধীনতা ইত্যাকার বিষয় বিচলিত করে না। কারণ শাসকের পরিবর্তন তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটায় না।"[৬]

দরিদ্র মানুষের জীবনে যুদ্ধ, ক্ষমতার পালাবদল তার কাছে নিতান্তই অহেতুক মনে হয়। ভূষণের গল্প সক্রিয় নারী চরিত্র শূন্য। ভূষণের স্ত্রীর সাথে যুদ্ধের কোনো সংযোগ দেখা যায় না। গণমানুষের জীবনে 'স্বাধীনতা' কেবলমাত্র একটি শব্দের অভিজ্ঞতার বাড়তি কিছু নয় সেটা তাদের জীবনের বাস্তবতা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মুক্তিযুদ্ধে অত্যাচারিত নারীর রূপ দেখা যায় এ গল্পে -

> "ভূষণ দেখলো এর মধ্যে চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে তার কালো কুতকুতে বাচ্চা কোলে তেঁতুল গাছের দিকে এগিয়ে এলো। ঠাস করে একটি শব্দ হলো। মেয়েটি বাচ্চার মাথায় হাত রাখে। ভূষণ দেখে মেয়েটির হাত দিয়ে গলগল করে রক্ত আসছে- শেষে রক্ত মেশানো সাদা মগজ বাচ্চাটার মাথা থেকে এসে তার মায়ের হাত ভর্তি করে দিলো। মেয়েটি ফিরে দাঁড়ালো, বাচ্চার মুখের দিকে চাইল, পাগলের মতো ঝাঁকি দিলো তাকে বারবার-তারপর অমানুষিক তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাচ্চাটাকে, দুহাতে ফালা ফালা করে ছিড়ে ফেললো তার ময়লা ব্লাউজটাকে। তার দুধে ভরা ফুলে ওঠা স্তন দুটিকে দেখতে পেল ভূষণ। সে সেই বুক দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, মার হারামির পুত, খানকির পুত- এইখানে মার। পরমুহূর্তেই পরিপক্ক শিমুল ফলের মতো একটি স্তন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ছিটকে সে এসে পড়ল তেঁতুলতলায়। আক্রোশপূর্ণ ভয়শূণ্য চাউনি নিয়েই সে মরে রইল।"[৭]

সন্তান হত্যায় ভয়শূন্য হয়ে ওঠে মেয়েটি। প্রবল আক্রোশে প্রতিরোধশূন্যতায় গালাগাল দিয়ে ওঠা মেয়েটিও স্বল্পায়ু। শিমুলের তুলোর মত ছিন্ন তার চেতনা ছড়িয়ে পরে বাংলার আকাশে বাতাসে।

'নামহীন গোত্রহীন' গল্পটিতে কোনো সক্রিয় নারী চরিত্র নেই বরং নির্যাতন ও হত্যার শিকার মমতার অস্থি কেশ কঙ্কাল নিয়ে সে পাঠককে জানান দেয় তার অস্তিত্ব। গল্পের নামহীন লোকটি জন্তুর মতো নখে আচড়ে, কোদালে কুপিয়ে একটি বাড়ির পেছন দিক থেকে খুঁজে বের করে মমতার কঙ্কাল।

> "তারপর উঠে এলো দীর্ঘ চুলের রাশ, কোমল কণ্ঠাস্থি, ছোট ছোট পাঁজরের হাড়, নিতম্বের হাঁড়-তারপর একটি করোটি।"[৮]

লেখক, পাঠকের জন্য প্রশ্নের দ্বার অবারিত রেখে যান, কৌতূহলের দ্বার উন্মোচিত করেন। মমতা, যুদ্ধের নৃশংসতা বর্বরতারই শিকার। যুদ্ধের প্রথাগত গল্পের বিবরণের বদলে যুদ্ধের অভিঘাত দেখানোয় মনোনিবেশ করেছেন হাসান আজিজুল হক। তাঁর নিজের কথায় পাই-

> "যে লোকটি আলোয়-অন্ধকারে শহরের গলিখুঁজির (গলিঘুঁজির) ভিতর দিয়ে সাপের মতো বুকে হেঁটে বেড়ায়, বড় রাস্তায় কেবলই জীপ চলে, পাকিস্তানি বাহিনীর লোকেরা অকথ্য নির্যাতনে মানুষ মারে, লোকটি ঢুকে পড়ে নিজের বা যে কারও বাড়িতে, উঠোনে গিয়ে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করে, পায় পাঁজরের অস্থি, শিশুর কচি করোটি, দীর্ঘ কালো চুলের রাশি, সে লোকটি তো আমিই। ন'মাসের স্মৃতি অভিজ্ঞতা এমনি করেই লিখে রাখার চেষ্টা করি। মোটেই গল্প লিখি না।"[৯]

'কৃষ্ণপক্ষের দিন' গল্পে দেখি মুক্তিযোদ্ধা ও পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যের সম্মুখ সমরের চিত্র। নারীর যোদ্ধা অস্তিত্ব এ গল্পেও দৃশ্যমান নয় বরং ধর্ষিত নারীর সুলভ উদাহরণ এ গল্পে পাওয়া যায়। নারীর ওপর অত্যাচারের নৃশংস দৃশ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে জীবন বাঁচানোর আশাকে স্তিমিত করে দেয়। নারীর ওপর র্ববরতা, লোলুপতা, রহমানের বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষাকে নিস্পৃহতার মোড়কে আদ্যপান্ত মুড়ে দেয়। সম্মুখ সমরের জন্য উঠে দাঁড়ায় বরিশালের রহমান। সম্মুখযুদ্ধে সহযোদ্ধাকে হারিয়ে বিলের তীরে পৌঁছুলে দলনেতা জামিল আবিষ্কার করে ধর্ষিতা মেয়েটিকে। বেয়নেট দিয়ে তার যোনিকে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে। লম্বা চুলের আড়াল দিয়ে সে তার নগ্নদেহ আড়ালের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিল। তার মধ্য দিয়েই জামিল দেখতে পায় অসংখ্য ক্ষতে, মাংসে, চর্বিতে জান্তব বীভৎসতায় জড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে। নারীদের বীভৎসতম পদ্ধতিতে নির্যাতন করে পাকবাহিনী। নির্যাতনকেন্দ্রে নারীদের অনাবৃত রাখা হতো। উপর্যুপুরি ধর্ষণে অনেকের মৃত্যু ঘটত। কেউ কেউ হারাতেন মানসিক ভারসাম্য। নারী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ মালেকা বেগম তাঁর একাত্তরের নারী গ্রন্থে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। প্রত্যক্ষদর্শীর জবানীতে-

> "কুমিল্লা শহরের দক্ষিণে চান্দাগ্রামের বাসিন্দা আমি। যুদ্ধের সময় একদিন এক বৃদ্ধা তাঁর ২০ বছরের গর্ভবতী মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। স্থানীয় থানা থেকে তাঁদের বাড়ির দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। পথে পাকিস্তানি সেনারা তাদের আটকায় এবং বৃদ্ধা মাকে মারধর করে মেয়েটিকে বন্দী করে নিয়ে যায়। দুদিন পর মেয়েটির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তার দেহে বর্বরতম নির্যাতনের চিহ্ন তখনো তাজা। তাঁর স্পর্শকাতর অঙ্গটি অত্যন্ত বিকৃত অবস্থায় ছিল।"[১০]

নারী নির্যাতনের এ চিত্র সারা বাংলাদেশেই প্রায় একই রকম। নারীর দেহকে ভোগ লালসার শিকার করে বিকৃত মানসিকতার চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে নারী দেহের বিভিন্ন অংশ কেটে, খুঁচিয়ে বিকৃত করে, গাছে ঝুলিয়ে রেখে বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, যা জেনেভা কনভেনশনের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। নারীর প্রতি লিংগভিত্তিক সহিংসতার রূপ এ গল্পে সুস্পষ্ট।

'ঘরগেরস্থি' হাসান আজিজুল হক এর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী জীবনালেখ্য নির্ভর গল্প। যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতার যৌথতায় নিজ ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়া রামশরণ স্বাধীন দেশে ফিরে আসে। রামশরণ স্বাধীন দেশে এমন অনেক কিছুই আশা করেছিল যা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বাস্তবতাসম্পন্ন নয় -

> "মানচিত্রে জলজ্যান্ত বাংলাদেশ দপদপ কর জ্বলছে আর সেই বাংলাদেশকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে মানুষ। ১৬ ডিসেম্বরের পরে ভারত থেকে ফিরে আসা নিরন্ন সর্বস্ব-খোয়ানো মানুষ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে বাংলাদেশ খুঁজে মরছে; নেই, নেই তার কেউ নেই, কিছু নেই। ভিটেমাটি ঘরবাড়ি নেই, দিগন্ত থেকে দিগন্তে শুধু খুঁজে মরা, নেই, কোথাও নেই বাংলাদেশ। স্বপ্নের বাংলাদেশ নয়, ক্ষুধার অন্নের বাংলাদেশ, বিরামের ঘর-বাড়ির বাংলাদেশ, আবরণের বস্ত্রের বাংলাদেশ, বাস্তব

> বাংলাদেশ! সে কি উধাও হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বরের পরে পরেই? আসতে-না-আসতে, দেখা দিতে-না-দিতে?"[১১]

অক্ষত ভিটেমাটি, দুবেলা দুমুঠো খেয়ে পরে শান্তিতে জীবনযাপনের মৌলিক অধিকার অক্ষুন্ন থাকবে এই বোধ তাকে শরণার্থীর জীবনেও প্রেরণা জুগিয়েছে এবং ফিরিয়ে এনেছে দেশে। কিন্তু স্বাধীন দেশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত, দ্বারে দ্বারে রিলিফের জন্য ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত রামশরণ ও তার স্ত্রী ভানুমতী। খাদ্যাভাব, চিকিৎসার অভাব, নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব-এর সবই রামশরণ ও ভানুমতীর সইতে হয়েছে। চোখের সামনে কনিষ্ঠ কন্যার ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়াও তারা নিস্পৃহের মতো মেনে নেয়-

> "এমনিতে কিন্তু আজকাল আর ভানুমতীর কোলে মেয়েটাকে আলাদা করে চেনা যায় না। কদকার কুৎসিত একটা টিউমারের মতো ভানুমতীর বাঁ দিকের পাঁজরে সে লেগে আছে। উলঙ্গ মেয়েটার দুদিকের কুঁচকির চামড়া ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে-মাথায় একটা চুল নেই, সমস্ত শরীরে শুকনো দাদের মত ঘা। রামশরণ জানে মেয়েটা মরছে, ভানুমতীও জানে, শুধু অভ্যাস আর নেহাৎ ওরা মানুষ বলে বয়ে বেড়াচ্ছে।"[১২]

ভানুমতী উদ্বাস্তুর জীবন, উদ্বেগের জীবনযাপন করে এসেছে। ফলে কোনো উদ্বেগ তাকে তীব্রভাবে স্পর্শ করে না। আব্রু রক্ষা বা সন্তানদের সামনেই কাপড় খুলে ক্ষতে হাত বুলাতে বা রামশরণকে দেখতে দ্বিধা করে না ভানুমতী। বস্তুত যুদ্ধ মানুষকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। জীবন বাঁচানোর সুতীব্র তাগিদে বাদবাকি লৌকিক আচার প্রথা সব গৌণ হয়ে পড়ে যুদ্ধের ডামাডোলে। ফলে লজ্জাশীলা ভানুমতী তেজোদীপ্ত হয়ে ওঠে। দেশে ফিরে একই অভাব জর্জর জীবন তার কাছে ক্লান্তিকর ঠেকে। প্রতিনিয়ত অভাব, শরণার্থীর জীবনকালে সন্তানের মৃত্যু সবই ভানুমতীকে বিচলিত, তীব্র করে তোলে। ফলে দেশ প্রত্যাবর্তনের পর রামশরণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের গল্প তার কাছে রূপকথার মতোই মনে হয়।

টিউমারের মতো মায়ের শরীর লেগে থাকা ভানুমতীর মেয়েটির নাম অরুন্ধতী। নক্ষত্রপতনের মতো অরুন্ধতীরও মৃত্যু হয়, শিয়ালের ভোজ্য হয় ভানুমতীর কন্যা। রামশরণ মরা মেয়েটার কাছেই শুয়ে থাকা ভানুমতীর জন্য জৈবিক তাড়না অনুভব করে-

> "কি একটা ঘোরে ভানুমতীর দিকে সে এগিয়ে গেলে ভানুমতীর চোখ অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে। তারার আলোতে রামশরণ সেই চোখে মারাত্মক আক্রোশ এবং অসহনীয় দু:খ দেখেও জোর করতে থাকে। তখন লাথি ছোঁড়ে ভানুমতী- সে রামশরণকে ফেলে দেয় ছিটকে, মুখে শুধু বলে, লজ্জা করে না তোমার?"[১৩]

নারী পুরুষের জৈবিক তাড়না সম্বরণের সমাজস্বীকৃত রূপ বিয়ে। নিজের বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি তাড়নাকে রামশরণ অযাচিত মনে করেনা কিন্তু সদ্য সন্তানহারা বেদনার্ত মায়ের সমাজ, সংসার, স্বামী সব কিছুর প্রতি তার যে অক্ষম আক্রোশ, তার সবটুকু জড়ো করে রামশরণকে লাথি দেয় ভানুমতী। সমাজের যাঁতাকলে পিষ্ট প্রান্তিক জনপদের প্রান্তিকতম সদস্য ভানুমতী। তার আক্রোশ, ক্রোধ, প্রতিবাদ কোনোটিই যুদ্ধোত্তর দেশের দগদগে বাস্তবতার দাগ কাটতে পারে না। ফলে পিপড়ের সারির হাজারো পিপড়ের একজন হয়ে স্বামী সন্তান নিয়ে আবারো অনিশ্চিত পথে পা বাড়ায় ভানুমতী। 'ম্যারিটাল রেইপ' শব্দবন্ধটি বর্তমানে বহুল আলোচিত। গল্পকার আশির দশকে প্রকাশিত এ গল্পে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নারীর প্রতি সমাজস্বীকৃত নির্যাতনের এ রূপটির বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠা নারীকে তুলে ধরেন।

'ফেরা' গল্পে আলেফ যুদ্ধ শেষে বাড়ি এসেছে। মা আর স্ত্রীকে জীবিত দেখে আলেফ নিশ্চিত হয়। তবে তার অনুভূতি নিশ্চিন্তের নয়।

> "মা মরে যায়নি-শুধু এই একটি ব্যাপার আলেফকে খুশি করে।"[১৪]

এ গল্পে আমরা মুক্তিযোদ্ধার মা ও মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী এ দুই পরিচয়ে নারী চরিত্র দেখতে পাই।

"প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার প্রত্যেক মা নিজেরাও ইতিহাসের অমোঘ প্রক্রিয়ায় হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা।"[১৫]

অধ্যাপক ড. নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা তাঁর একাত্তরের প্রচ্ছদ-এ মুক্তিযোদ্ধার মায়েদের কথা সংকলিত করেছেন। চিরন্তন মাতৃস্বরূপা মায়ের সন্তানকে ভালো রাখবার আকুতি, সন্তানসম অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি দরদ, দেশের মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা এর সবই মূর্ত হয়ে উঠেছে মুক্তিযোদ্ধার মায়েদের ভাষ্যে। কেউ কেউ হারিয়েছেন মানসিক ভারসাম্য, কেউ আবার সন্তানের আত্মত্যাগের স্মৃতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। এ গল্পে আলেফের মায়ের অকুতোভয়তাও বিশেষ লক্ষণীয়। রাজাকার ও পাক হানাদারদের অত্যাচারের সামনেও নির্বিকার চিত্তে আলেফের মা আলেফকে গালাগাল, নিজের অদৃষ্টকে দোষ দেয়-

"একদিন মিলিটারি আইল গাঁয়ে আগুন দিতি।

আগুন দিইছে?

হ। আগুন দেলে; সব বাড়ি পোড়ায়ে দেলে। কয় ছেমরা আমার বাড়ি আস্যে তোর খোঁজ নেলে অনেক।

তুমি কি বললে?

আগুনে গাঁ পোড়তে লাগল- সে কি আগুন তোরে কবো আলেফ- ছ্যামরা কডা আমারে কয়, ও বুড়ি আলেফ কনে?

আমি বললাম, আলেফের খোঁজ জানে কিডা? আমি মরতিছি নিজের জ্বালায়। সে শুয়োর কোঁয়ানে মরতিছে তার আমি কি জানি? আলেফ, আমি ঠিক বলি নি?

ঠিক বলিছ? তোমার আলেফ ছিল কনে কও তো দেহি।

তুই নড়াইয়ে ছিলি বাপ- আলেফের মা সোজা হয়ে দাঁড়াল।"[১৬]

মুক্তিযোদ্ধার মায়েরাও দেশের অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠে আলেফের মায়ের মতো। সন্তানকে নিরাপদ রাখার আকাঙ্ক্ষায় অনায়াসে মিথ্যে বলে এই বৃদ্ধা, সন্তানকে ফিরে পেয়ে তিনি চান সরকারের কাছে স্বীকৃতি। ভাবেন, এই বুঝি অভাবগ্রস্ত দিনযাপনে কোনো বদল এলো। কিন্তু পরিবর্তন আসেনা বরং আশ্বাসহীনতায়, রাইফেল ফেরত দিতে বলায় আলেফ বাড়ির পেছনের ডোবায় রাইফেল ফেলে দেয়। আলেফের স্ত্রী আলেফকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল চরমতম দারিদ্র্যের কারণে। উপোসের জ্বালা সইতে না পেরে গৃহত্যাগী আলেফের স্ত্রী ফিরে এসেছে যুদ্ধরত স্বামীর গৃহে। উন্নত জীবনের, নিশ্চিত খাদ্য-বস্ত্রের সংস্থান হবে এমন ভাবনা তার মনে উঁকি দেয়নি তা ভাবা দুষ্কর। হাসান আজিজুল হক যুদ্ধের অভিঘাতে মা ও স্ত্রীর দু'ধরনের বোধের চিত্র তুলে ধরেছেন এ গল্পে। আলেফের স্ত্রী ও বৃদ্ধ মা স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্যবস্তু সম্পর্কে আশাবাদী। আলেফের স্ত্রী দুঃখ-কষ্ট মুক্ত একটা জীবন ও স্বচ্ছন্দে ভাত কাপড় পাবার আশা করে। আলেফের মা ভবিষ্যৎ সুদিনের কথা চিন্তা করে বলে:

"তোরে একা না ডাকুক, তোরা যারা নড়াইয়ে (লড়াইয়ে) ছিলি তাদের ডাকপে না? আমি আমার এই ভিটের চেহারা ফেরাবো আলেফ কয়ে দেলাম আর জমি নিবি এটু। এট্টা গাই গরু আর দুটো বলদ কিনবি।"[১৭]

নামহীন গোত্রহীন গল্পগ্রন্থে হাসান আজিজুল হক মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করেই গল্প লিখেছেন।

"স্ফুলিঙ্গের মতো মুক্তিযুদ্ধের অনেক উজ্জ্বল চিত্র আমাদের ছোটগল্পের ক্যানভাসে উদ্ভাসিত।"[১৮]

হাসান আজিজুল হক বিচ্ছিন্ন এবং বিচিত্র প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের উপাদানসমূহকে স্থাপন করেছেন। সমাজ, অবক্ষয়, হতাশ্বাস, নৈরাশ্যের প্রাধান্যে নারীর অবয়ব নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুনত্ব বা নিরীক্ষাপ্রবনতা এর কোনোটিরই পরিচয় দেননি গল্পকার। বরং মুক্তিযুদ্ধের গল্পের প্রথাগতভঙ্গিতে নারীকে এঁকেছেন নিরাসক্ততায়। ধর্ষণ, নির্যাতনের রগরগে বর্ণনায় 'মেল গেজ' তুষ্ট করার বদলে সংক্ষুব্ধ মুক্তিযোদ্ধার বর্ণনা দিয়েছেন গল্পকার। নারীর প্রথাগত সর্বংসহা মাতৃত্বের ধারণার বদলে প্রতিবাদী মা এবং নিজ স্বার্থ সচেতন মুক্তিযোদ্ধার মায়ের নবতর সংযোজন ঘটিয়েছেন গল্পকার।

তথ্যসূত্র :

১. মাওলা, আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলাদেশের সাহিত্য,* মুক্তধারা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৯৩
২. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, *বাংলাদেশের সাহিত্য,* আজকাল প্রকাশনী, ঢাক, ২০০৯, পৃ. ৩৩৬
৩. ইসলাম, রফিকুল, *বাংলাদেশের সাহিত্য; ছোটগল্প,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৪১
৪. ইসলাম, আজহার, *বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৬
৫. জাফর, আবু, *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজ বাস্তবতা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৯১
৬. ডিনা, সরিফা সালোয়া, হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প বিষয় ও প্রকরণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৫৬
৭. হক, হাসান আজিজুল, ২০১৮, পৃ. ১৮
৮. হক, হাসান আজিজুল, ২০১৮, পৃ. ২১
৯. হক, হাসান আজিজুল, *অতলের আঁধি,* জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৯১
১০. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৮২
১১. হক, হাসান আজিজুল, *অতলের আঁধি,* জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৯৩
১২. হক, হাসান আজিজুল, ২০১৮, পৃ. ৬২
১৩. হক, হাসান আজিজুল, ২০১৮, পৃ. ৭২
১৪. হক, হাসান আজিজুল, ২০১৮, পৃ. ৮৮
১৫. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ঢাকা ২০১৮: পৃ. ১৫৫
১৬. হক, হাসান আজিুজুল, ২০১৮, পৃ. ৮৯
১৭. হক, হাসান আজিজুল, ২০১৮, পৃ. ৯০
১৮. বেগম, আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলাদেশের সাহিত্য,* মুক্তধারা, ঢাকা ২০১৫, পৃ. ১০৮

আকর গ্রন্থ :

১. হাসান আজিজুল হক : *নামহীন গোত্রহীন*

সহায়ক গ্রন্থ :

১. আজহার ইসলাম (১৯৮৫), *সাহিত্যে বাস্তবতা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা
২. আজহার ইসলাম (১৯৯৬), *বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৩. আবু জাফর (১৯৯৬), *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজ বাস্তবতা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৪. আহমেদ মাওলা (২০১৫), *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলাদেশের সাহিত্য,* মুক্তধারা, ঢাকা
৫. কঙ্কর সিংহ (২০১৭), *ধর্ম ও নারী প্রাচীন ভারত,* র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা
৬. জীনাত শারমিন (২০১৬), *হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প বিষয় ও শিল্পরূপ,* আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা
৭. ড. নাহিদ হক (২০১২), *বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে নারী,* জয়তী, ঢাকা
৮. ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ (১৯৯৭), *মুক্তিমঞ্চে নারী,* প্রিপ ট্রাস্ট, ঢাকা
৯. ড. নীরুকুমার চাকমা (১৯৮৩), *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১০. পূরবী বসু (২০১৭), *আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলার নারী,* বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা
১১. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯), *বাংলাদেশের সাহিত্য,* আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা
১২. বীরেন্দ্র দত্ত (১৯৮৫), *বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা
১৩. মালেকা বেগম (২০১৮), *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ঢাকা

১৪. মাহবুবুল হক (২০১৫), *মুক্তিযুদ্ধ, ফোকলোর ও অন্যান্য*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা
১৫. মাহমুদ শামসুল হক (২০০০), *বাঙালি নারী*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা
১৬. মুনতাসীর মামুন (২০১৩), *মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১*, অনন্যা, ঢাকা
১৭. রফিকুল ইসলাম (১৯৮৮), *বাংলাদেশের সাহিত্য; ছোটগল্প,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা
১৮. সরিফা সালোয়া ডিনা (২০১০), হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প বিষয় ও প্রকরণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১৯. সুলতানা কামাল (২০১০), *নারী, মানবাধিকার ও রাজনীতি*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা
২০. সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৯৭), *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
২১. হাসান আজিজুল হক (১৯৯৮), *অতলের আঁধি*, জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশন, ঢাকা।
২২. হুমায়ুন আজাদ (২০০৪), *নারী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা
২৩. সম্পা. চন্দন আনোয়ার (২০১৪), *এই সময়ের কথাসাহিত্য-১*, অনুপ্রাণন প্রকাশন, ঢাকা
২৪. সম্পা. বদরুদ্দিন উমর (২০০৯), *নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে,* শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা
২৫. সম্পা. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক (২০০৪), *আমি নারী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা
২৬. সম্পা. অধ্যাপক মো: আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী (২০১৬), *নারী ও রাজনীতি,* অবসর, ঢাকা
২৭. সম্পা. রাশেদুর রহমান (২০১৭), *নারী ১৯৭১ নির্যাতিত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার,* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা